পেশায় ডাকঘরের কর্মী, জাতে লেখক

অমিয়ভূষণ মজুমদার। আগামী বৃহস্পতিবার তাঁর জন্মশতবর্ষ। চাকরি, ট্রেড ইউনিয়ন, সংসার সামলে বাংলা সাহিত্যকে দিয়ে গিয়েছেন ‘গড় শ্রীখণ্ড’, ‘মধু সাধুখাঁ’-র মতো উপন্যাস।

আবাহন দত্ত
১৮ মার্চ , ২০১৮, ০০:০০:৩৭
শেষ আপডেট: ১৮ মার্চ , ২০১৮, ০৪:৩৫:১৮

7

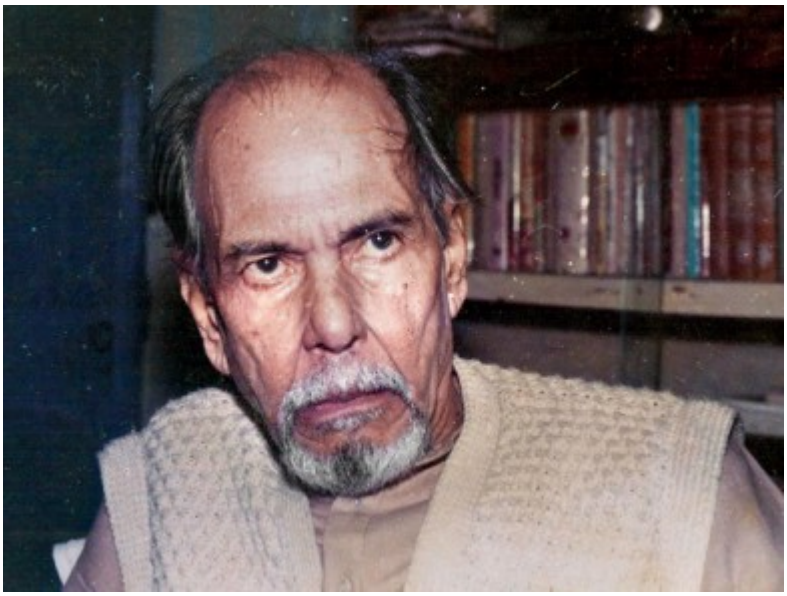

শতবর্ষে: অমিয়ভূষণ মজুমদার। ছবি সৌজন্য: হিমাংশুরঞ্জন দেব

কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের একটা কথা দিয়ে শুরু করা যায়: ‘কুরুক্ষেত্রে সবাই শয্যা নিয়েছেন। পিতামহ ভীষ্মের মতো আজও শরশয্যায় জেগে আছেন অমিয়ভূষণ।’ অমিয়ভূষণ মজুমদার তখনও জীবিত। আশ্চর্য গদ্য, দেশি-বিদেশি অজস্র অনুষঙ্গ, আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা আর কাহিনি-বৈচিত্র— আজও বেঁচে এ-সবে। আগামী ২২ মার্চ তাঁর জন্মের শতবর্ষ।

অমিয়ভূষণের জন্ম বাংলা মতে এক শুক্রবারে (৮ চৈত্র ১৩২৪), ইংরেজি মতে শনিবারে। মামাবাড়ি কোচবিহার শহরে। জন্মের পর চলে আসেন পৈতৃক ভিটে, পাবনা জেলার পাকুড়িয়া গ্রামে। অমিয়ভূষণের বাবার ঠাকুরদা মথুরাপ্রসাদের ছিল একটা নীলকুঠি এবং তার সংলগ্ন জমি-জিরেত। এখানেই বেড়ে ওঠা ভবিষ্যতের সাহিত্যিকের।

বেড়ে ওঠার ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লেখকের নিজের বয়ানেই জানা যায়, তাঁর ‘নীল ভুঁইয়া’, ‘রাজনগর’, ‘গড় শ্রীখণ্ড’ উপন্যাসগুলি কোনও না কোনও ভাবে এই বাড়ির সঙ্গে যুক্ত। অমিয়ভূষণের বাবাও নাকি তাঁর মা-কে বলেছিলেন যে না-দেখে, না-শুনেই তাঁর ঠাকুরদাদাকে দিব্যি এঁকে ফেলেছেন তাঁর ছেলে। আসলে এই নীলকুঠির সঙ্গে জীবনের এক-এক পর্যায়ে এক-এক ভাবে জড়িয়ে ছিলেন অমিয়ভূষণ। ছেলেবেলায় তা কল্পনার দুর্গ। বড় হয়ে শরিকি বিবাদে দীর্ণ এক ক্ষয়িষ্ণু জোতদারবাড়ি।

ঠিক একই ভাবে অমিয়ভূষণের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ পাকশি রেল কলোনির দিনগুলো। সেই শহরের ডাকঘরে অনেক দিন চাকরি করেছেন তিনি। সে সময় থেকেই সন্ধে হলে কাগজকলম নিয়ে বসা অভ্যেস। লিখেই যান, আর লেখার শেষে কাগজগুলি ছিঁড়েই যান। এক দিন হঠাৎ তাঁর স্ত্রী বললেন, ‘‘লেখো তো বটে, কিন্তু ছাপে না তো কেউ।’’ টেবিলে ছিল পূর্বাশা পত্রিকা। আগে সেটা কখনও দেখেননি অমিয়ভূষণ। নতুন লেখাটা পরের দিনই পূর্বাশা-য় পাঠিয়ে দিলেন। পনেরো দিনের মধ্যেই তাঁর কাছে এসে পৌঁছল এক কপি পত্রিকা, সঙ্গে মানি অর্ডারে পনেরো টাকা! অর্থাৎ ‘পাবলিশড’। হ্যাঁ, অমিয়ভূষণ এ রকমই বলতেন। কারণ আদ্যন্ত বাংলা কথনে তিনি ব্যবহার করেন ‘ভ্যালুস’, ‘মর‍্যালিটি’, ‘ট্রমা’, ‘হিন্টারল্যান্ড’-এর মতো শব্দ। যাই হোক, সদ্য প্রকাশিত গল্পটির নাম ছিল ‘প্রমীলার বিয়ে’।

এর পরে টানা লিখে গিয়েছেন। পূর্বাশা, চতুরঙ্গ, ক্রান্তি, গণবার্তা— নানান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে একের পর এক লেখা। তাঁর লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছেন আবু সয়ীদ আইয়ুব, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস’-এর লেখক নীহাররঞ্জন রায় আর মনোজ বসু এক বার কোচবিহারে এসেছেন। মনোজবাবু আড্ডায় অমিয়ভূষণকে অনুযোগ করলেন, ‘‘আপনি বড় বেশি বই পড়েন। লেখাগুলি তাই ইন্টেলেকচুয়াল।’’ নীহাররঞ্জন বললেন, ‘‘মনোজবাবু না হয় সকলের জন্য লিখছেন, কিন্তু আমাদের জন্যও তো কেউ লিখবেন। অমিয়বাবু বরং আমাদের জন্যই লিখুন।’’

আরও পড়ুন: [জ্যোতির্বিজ্ঞানী যখন উকিল]

অতঃপর কোচবিহার। দেশভাগের প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালে, অগস্ট মাসের শুরুতে উত্তরবঙ্গের এই শহরে বদলি হয়ে যান অমিয়ভূষণ। এটা এক রকম ঘরে ফেরা। কারণ তাঁর স্কুল-কলেজ জীবন কেটেছে এই শহরেই। ১৯২৭ সালে কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ। তার পর কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ। এখন তা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ। সেখান থেকে ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে স্নাতক, অতঃপর ডাক বিভাগে চাকরি। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় কোচবিহারেই থিতু হওয়া। এখানে বলা যেতে পারে, অমিয়ভূষণ কখনও বেকার ছিলেন না। তাঁর কলমে, ‘‘মনস্তাত্ত্বিকেরা বলতে পারেন, হয়তো এই জন্য আমার কবিতা লেখা হয়নি, এবং এই জন্যই প্রেমের গল্প লিখতে পারিনি।’’

কোচবিহারে লেখালেখি চলতে থাকে নিরন্তর। ১৩৬০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় পূর্বাশায় ‘গড় শ্রীখণ্ড’ প্রকাশিত হতে শুরু করে। তখন চতুরঙ্গে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে ‘নয়নতারা’, যা পরে ‘নীল ভুঁইয়া’ নামে বেরয় (১৩৬১, পৌষ)। চতুরঙ্গ, পরিচয়, বারোমাস, কৌরব, লাল নক্ষত্র, গণবার্তা— একের পর এক ছোট পত্রিকায় বেরিয়ে চলেছে তাঁর নানা গল্প। কেমন সে সব? নামগুলো শুনলে খানিকটা বোঝা যায়: ‘তন্ত্রসিদ্ধি’, ‘নেই কেন সেই পাখি’, ‘নির্মল সিংঘির অপমৃত্যু’, ‘অর্পিতা সেন সাত একর’। শিরোনামের মতো গল্পগুলোও অস্বস্তি দেয়, ভাবায়। মানুষের এবং সমাজের ক্লেদাক্ত দিক উঠে আসে। আসলে পাঠককে আয়নার সামনে যেন দাঁড় করিয়ে দেয় এ সব লেখা। রাজা, জমিদার, মধ্যবিত্ত থেকে সর্বহারা, তাঁর চরিত্র সবাই। কিন্তু মানুষকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে মাটি, আকাশ, জল, হাওয়া, গাছপালা দিতে হয়। তাই নিজের চেনা জায়গাগুলোর ছবি এঁকে দেন লেখায়। আর তাঁর সবচেয়ে ভাল লাগার জায়গা কোচবিহার। এই শহর অমিয়ভূষণের প্রথম প্রেম।

অমিয়ভূষণ কিন্তু কলকাতাতেও এসেছিলেন। তবে থাকেননি বেশি দিন। বাবার ইচ্ছে ছিল, ছেলে ইংরেজি পড়ুক। তাই আইএ পাশ করার পর ভর্তি করেছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। ক’দিন বাদেই কঠিন অসুখ। অমিয়ভূষণ স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতেই বিষয়টা ভাঙেন না: ‘‘কলকাতায় মাস তিন-চার থাকার পড়ার পর কী হলো— সানস্ট্রোক হতে পারে, মেনিনজাইটিস হতে পারে, মাথার কষ্টসমেত ইনফ্লুয়েঞ্জা হলেই-বা কী দোষ, back to pavilion!’’ কেউ হয়তো বলবেন দুর্ভাগ্য। নামী কলেজে পড়ার সুযোগ হাতছাড়া হল। অনার্স পাশ করতে হল কোচবিহারের কলেজ থেকে। কিন্তু অমিয়ভূষণ বলেন, ওটা ‘ভাগ্য’ নয়, ‘অ্যাকুমুলেশন অব অ্যাক্সিডেন্টস’। উল্লেখ্য, ছোটবেলাতেও এক বার মাস-তিন চারের জন্য কলকাতা বাসের ব্যবস্থা হয়েছিল তাঁর, ট্রপিক্যাল স্কুল অব মেডিসিন-এর পাইকপাড়া ওয়ার্ডে। কোনও এক জটিল ব্যারামের কারণে। ‘কলকাতা নামক ঔপনিবেশিক শহর আর কনজিউমার গুডসের আড়ত’ অমিয়ভূষণের বড় অপছন্দের।

কলেজে ভর্তি হওয়ার পর একটা নেশা চেপে বসেছিলেন তাঁর। আলমারির নেশা। সকাল দশটা থেকে পাঁচটা কেবল বই পড়তেন। টমাস হার্ডির ‘জুড দ্য অবস্কিয়োর’, ডি এইচ লরেন্সের ‘সন্‌স অ্যান্ড লাভার্স’, দস্তয়ভস্কি আর তলস্তয়ের ছোটগল্প। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি শুধুই পড়তেন।

আর তাঁর লেখা? গল্পখোর পাঠককে মৌতাত দিতে সোজাসাপটা প্লট নয়। ‘উপন্যাস সেই মহাকাব্য যা গদ্যে লেখা হয়’, লিখেছিলেন অমিয়ভূষণ। বন্ধু গণেশ পাইনকে নিয়ে এক বার কোচবিহারের চিলাপাতা অরণ্যে বেড়াতে গিয়েছেন। দেখলেন, জঙ্গলে পড়ে আছে এক ভাঙা নৌকো। সেই নৌকো দেখেই জন্ম নিল তাঁর উপন্যাস ‘মধু সাধুখাঁ’। তিস্তা, করতোয়া বেয়ে মধু নৌ-বাণিজ্যে যায়।

তখন কলেজে পড়েন। তাঁর মাস্টারমশাই এক দিন বলেছিলেন, ‘‘প্যাঁচালো সেনটেন্স লিখলে অনার্স পাবে না।’’ অমিয়ভূষণের পালটা: ‘‘যদি পরীক্ষা দিই এমন কেউ নেই যে অনার্স না-দিয়ে পারবেন!’’ পরে মন্তব্য, ‘‘ইংরেজিতে এটাও একটা প্যাঁচালো সেনটেন্স হয়ে গেলো।’’ আসলে অমিয়ভূষণ এমনই। ‘তাঁতী বউ’ গল্পে লেখেন, ‘গঞ্জে পাঠাবার মতো সরেস জিনিস তার তাঁতে উৎরাত না, বড় জোর শাদা সুতোর বুটি উঠত; আর বহরে সেগুলো শাজাদীর দরবারী শাড়ি হত না, কাজেই রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে কয়েকটি মুহূর্ত ছাড়া বড় বেশি কারো চোখে পড়ত না তার কারিগরি; বড় জোর সকালে কোনো স্বামী দেখতে পেত, রাত্রির শুকনো মালাগাছির সঙ্গে বিছানায় পড়ে আছে মাকড়সার শাদা জালির মতো কি একটা।’’ এ ভাবেই বলতে ভালবাসতেন অমিয়ভূষণ।

জাত লেখক, সন্দেহ নেই। তবে লেখাটা প্রাথমিক কর্তব্য বলে ভাবেননি। বরং চাকরি, ট্রেড ইউনিয়ন, স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটানোর পর যে সময়টা বাঁচত, তখন লিখতেন। চির কালই লিখতেন ছোট পত্রিকায়। ‘ছোট’তেই তাই বেঁচে আছেন অমিয়ভূষণ। আজ শতবর্ষেও।

Enter your email ID here সাবস্ক্রাইব
এই ধরণের খবর আপনার ইনবক্সে পেতে ইমেল আইডি প্রদান করুন

TAGS : Amiya Bhushan Majumdar Novelist অমিয়ভূষণ মজুমদার Bengali Literature